ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

সোমপুর মহাবিহার: অষ্টম শতাব্দীর একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়

*মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান চৌধুরী

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন ধর্ম, কৃষ্টি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির এক বিচিত্র লীলাভূমি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে উত্তরবাংলার বড়ো একটি অংশের নাম ছিল বরেন্দ্র। একাদশ শতকের বরেন্দ্রকবি সন্ধাকর নন্দী তাঁর সংস্কৃত 'রামচরিতম' কাব্যগ্রন্থে গঙ্গার (পদ্মা) উত্তরে করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বরেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বরেন্দ্রভূমিকে সমকালীন বাংলার পাল রাজগণের জন্মভূমি (জনকভূ) এবং তার কেন্দ্রভূমি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তিকে 'বসুধার শীর্ষস্থান' (বরেন্দ্র মণ্ডল চূড়ামণি) বলে বর্ণনা করেছেন। মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর 'তবকাত- ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিখেছেন, গঙ্গা নদীর দু পার্শ্বে অবস্থিত লখনৌতি রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চল বরেন্দ্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত।[১] এছাড়া কানিংহামের বিবরণে, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড' ও 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক গ্রন্থেও বরেন্দ্র জনপদের উল্লেখ আছে। সুদূর রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে কত বিচিত্র জাতির আগমন ঘটেছে গ্রীষ্মপ্রধান ও উর্বরা এ বরেন্দ্র অঞ্চলে। রাজ্য, নগর, মহল, দুর্গ, সংঘারাম, মঠ, মন্দির, বিহার প্রভৃতি তাঁরা গঠন করেছে। সময়ের বিবর্তনে সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার এসেছে নূতন দল, তাঁরাও উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে মিলিয়ে গেছে কালের গর্ভে। উত্তরবাংলার বরেন্দ্রভূমির আনাচেকানাচে স্থানীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক নির্মিত বহু মন্দির-বিহার-অট্টালিকাসমূহের একাংশ কালের প্রবাহে চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখন খননকার্যের মাধ্যমে সেগুলোর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব হচ্ছে। এ ধরনের একটি উদ্ধারকৃত গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীনকীর্তি, অষ্টম শতকের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় 'পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধ বিহার'। এর বিস্তৃত পরিচয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও পর্যলোচনার মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

বিহার বা মঠের উৎপত্তি:

বিহার বা মঠের শাব্দিক অর্থ আশ্রম বা আখড়া, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন এবং ধর্মালোচনা করতেন। ভিক্ষার অর্থে যারা জীবন ধারণ করেন তাঁরাই ভিক্ষু। এঁরা সংসারত্যাগী বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসী। অন্যদিকে বিহার অর্থ ভ্রমণ (পরিব্রাজন) বা বিচরণ। এক স্থান হতে অন্য স্থানে যারা ভ্রমণ বা বিচরণ করে বেড়ায় তারা ভ্রমণকারী বা বিচরণকারী। এ শব্দটি ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাথমিক যুগে শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে এসব মঠ-বিহারগুলোর সৃষ্টি হয়নি। বস্তুত ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের জন্যই বৌদ্ধ বিহারগুলি নির্মিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রাথমিক যুগে (গৌতমবুদ্ধের জীবদ্দশায়) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দীক্ষা গ্রহণ, বসবাস, ধর্মপ্রচার, উপাসনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান বা উপাসনালয় ছিল না। বনে-জঙ্গলে, পর্বত গুহায়, বৃক্ষতলে-এরূপ যে কোনো নির্জন স্থানে তাঁরা বসবাস ও ধ্যানমগ্ন হয়ে সাধনায় রত থাকতেন। 'কঠোর সাধনে সিদ্ধি লাভ' এটাই ছিল বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। পালি আদিগ্রন্থ 'চুল্লবগ্‌গ' এ বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষ ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি-বাদলের দেশ হওয়ায় ভিক্ষুদের বছরে তিন

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী

মাস খুবই কষ্ট হতো। ভিক্ষুদের এহেন কষ্টদায়ক অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে গৌতমবুদ্ধ পাঁচ ধরনের বাসগৃহ (বিহার, অঢ্যোগ, পাসাদ, হম্মিয়, গুহা) নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে মঠ বা বিহার, সংঘারাম, স্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেসঙ্গে এসব বিহারে ভিক্ষুদের বসবাস একটি ধর্মীয় প্রথা হিসাবে গণ্য হয়। কথিত আছে যে, রাজা বিম্বিসার কর্তৃক রাজগৃহের বেলুবনে সর্বপ্রথম বিহার নির্মিত হয়। বিহারগুলির নির্মাণকার্য কেবল যে রাজন্যবর্গ বা ধনবান শ্রেষ্ঠীদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা নয়, বৌদ্ধ ভক্ত ও গৃহী-শিষ্য, এমনকি বৌদ্ধভিক্ষুদের আর্থিক সাহায্যে এগুলি গড়ে উঠেছিল।[২] পরবর্তীকালে অর্থাৎ গুপ্ত পরবর্তী পাল যুগে এসে বিহার বা মঠগুলি হয়ে ওঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মালোচনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন, বিদ্যাচর্চা, অভিসন্দর্ভ তৈরি, গ্রন্থ রচনা, পুথি নকল ও অনুবাদ এবং পাঠদান কেন্দ্র, যা আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়।

পাল যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা:

বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণে বৌদ্ধ সংঘের বিরাট ভূমিকা ছিল। কেননা সংঘই বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি নির্ণয় করত। মূল শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বিহার ও সংঘারামগুলি। গুরু গৃহে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য টোলের ব্যবস্থা থাকলেও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সে যুগে মঠ বা বিহারগুলি ছিল একেকটি উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান। বৌদ্ধশিক্ষায় জাতি বিচার ছিল না। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য থাকা, খাওয়া, বিদ্যা অনুশীলন ও আচার্য বা শিক্ষকদের পাঠদানের সুব্যবস্থা ছিল এ মঠগুলিতে। তাদের খাওয়া এবং হাতখরচ বাবদ অর্থ মহাবিহার হতে দেওয়া হত। এ বিহারগুলোতে যৌথভাবে প্রাজ্ঞ বৌদ্ধভিক্ষুরা আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। উপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী আর্যরা শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভিক্ষুরূপে গড়ে তোলা। এছাড়া বিভিন্ন কলাবিদ্যা ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যারও (যাকে পালি ভাষায় তিরচ্ছামি বলা হয়) শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন তাদেরকে উপাধিপত্র (diploma) দেওয়া হতো। দেশ–বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিদ্যার্থীরা মঠে অবস্থান করে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের পরিচর্যায় দীর্ঘকালীন শিক্ষা শেষ করে কেউ কেউ ধর্মপ্রচার কার্যে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভিক্ষুবেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে (বিহার বা মঠ) জ্ঞানদান কার্যে মনোনিবেশ করতেন। আবার কেউবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে গৃহস্থালির কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তেন। পালরাজন্যবর্গ এবং তাঁদের মন্ত্রীরা তাঁদের সন্তানদের নৈতিক বিষয়ে শিক্ষার্জনের জন্য এসব বৌদ্ধমঠে পাঠিয়ে দিতেন। এ নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে ওদের মধ্যে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা এবং নৈতিকতাপূর্ণ আচরণের বিকাশ ঘটানো। সোমপুর মঠেই এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। এ মহাবিহারে প্রায় ১৩ ফুট দৈর্ঘ্যের ১৭৭টি কক্ষে আটশ'র বেশি বিদ্যার্থী, আচার্য, স্থবির বসবাস করার স্থান সংকুলান হত। সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে বাংলার বৌদ্ধমঠগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চায় বৌদ্ধমতের পণ্ডিতেরাই অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো ঘরে

বসে অথবা ধর্মীয় আশ্রয়ে থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন না। বৌদ্ধগণ সংঘারাম-বিহারে বসে সমবেতভাবে বিদ্যাবর্ধন ও বিদ্যা বিতরণ করতেন। তাঁদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় শুধু সৌগত (বৌদ্ধ) মত এবং সে মতের পোষক তত্ত্ব দর্শন ছিল না, তারা ব্রাহ্মণদের বিদ্যাও আলোচনা করতেন এবং নিজেদের বিশিষ্ট ধর্মমতের আনুষঙ্গিক মূর্তি, চিত্র, স্থাপত্য ও লিপিশিল্প রীতিমত অনুশীলন করতেন। আমাদের দেশের সেকালের বৌদ্ধবিহারগুলিই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।"[৩]

পাল বংশ ও পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং তার দু এক শতাব্দী আগে থেকেই বাংলায় ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল। দশম ও একাদশ শতকের অগণিত প্রশস্তি লিপিমালায় এর প্রমাণ আছে। এ লিপিগুলো এবং চতুর্ভুজের 'হরিচরিত' কাব্য হতে জানা যায় - বাংলাদেশে এসময় যে সব বিদ্যার চর্চা হতো বেদ, আগম, নীতি, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র), পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই তার অন্তর্গত ছিল। চার বেদেরই (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হতো। বিশেষভাবে অথর্ববেদ থেকে প্রাচীন চিকিৎস্যাবিদ্যা ও নানাবিধ রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় আলোচিত হতো। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিবিধ গ্রহ-নক্ষত্র, বৎসর, মাস, বার, পক্ষ, রাশিচক্র, কোষ্ঠীনির্ণয়, জাতকনির্ণয়, সময়নির্ণয়, যাত্রার শুভাশুভ, বিবাহের বিভিন্ন লক্ষণাদি ও শুভাশুভ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, বৃক্ষরোপণাদি ব্যবস্থা, শস্যছেদন, মোক্ষ, দীক্ষা প্রভৃতি বিষয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব বিদ্যার চর্চা যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্বজ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তা নয়, মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এসব শাস্ত্রেও অনুশীলন করতেন। পালদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যেমন-দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরুবমিশ্র ও শাণ্ডিল্যমিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা আমরা বিভিন্ন লিপিমালা (মঙ্গলবাড়ির গরুড়স্তম্ভ অভিলেখ) থেকেই প্রমাণ পাই। ক্ষেমেন্দ্রের 'দশোপদেশ' গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয়, বাঙালি বিদ্যার্থীরা কাশ্মীরে যেতেন বিদ্যার্জনের জন্য এবং সেখানে তর্ক, মীমাংসা, পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করতেন। বাঙালি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ আচার্যরাও যে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার বাইরে নানান স্থানে যেতেন বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে, তার নানা প্রমাণ বিদ্যমান। সাহসী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণবৃন্দ ভারতের বাইরে বিশেষ করে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, যবদ্বীপ, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদেশে পাড়ি দিতেন বিদ্যার্জন, জ্ঞানদান ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহারগুলিতে (বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যারা করতেন, রাজা-মহারাজা ও সামন্ত-মহাসামন্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য অর্থদান, ভূমিদান ইত্যাদি করতেন, এমন সাক্ষ্যও যে নেই তা নয়। পণ্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাঁরা পুরস্কৃতও করতেন, সে সাক্ষ্যও বিদ্যমান। লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়।[৪]

সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও সমৃদ্ধিঃ

সোমপুর মহাবিহারের খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধি বিদেশি পর্যটক, ঐতিহাসিক ও লেখকদের গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তানচেংতান, লামা তারানাথ ও অন্যান্য

পরিব্রাজকগণ সোমপুর বিহারের ঐতিহ্য, খ্যাতি ও গৌরবের কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এ বিহার সম্পর্কে তিব্বতীয় গ্রন্থে বহু প্রশংসা বাক্য আছে। লামা তারানাথ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "ধর্মপালদেব তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য ৫০ টিরও বেশি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" তন্মধ্যে বরেন্দ্রের সোমপুর মহাবিহার তাঁর প্রধান কীর্তি। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্র এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন।

অষ্টম শতকের শেষার্ধে ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপী সুসমৃদ্ধ সোমপুর মহাবিহার গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল বাংলাদেশের একক বৃহত্তম মহাবিহার। মহাবিহারটি ছিল সে সময়কার একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। পাল রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশি বিদেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু-আচার্য-স্থবিরদের অক্লান্ত চেষ্টায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বৌদ্ধজগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিক্ষুরা নালন্দা, বুধগয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থানে অর্থ ও ধনরত্ন দান করতেন বলে বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে ১০ম /১১শ শতকে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধিশালী অবস্থা এবং একই সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবিরদের প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে চীন, তিব্বত অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে যে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু বিদ্যার্জন ও ধর্মশিক্ষার জন্য সোমপুরে আগমন করতেন এবং সোমপুর থেকে যেসব বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারক নানা দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য গমন করতেন তারা সম্ভবত তৎকালে বহুল ব্যবহৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ (আন্তর্জাতিক রুট) ধরেই যাতায়াত করতেন। ঐরূপ একটি প্রধান স্থলপথে বাংলাদেশ থেকে আসাম, মনিপুর, মায়ানমারের (ব্রহ্মদেশ) উত্তর পাশ দিয়ে দক্ষিণ চীনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাছাড়া স্থলপথে মায়ানমারের সাথে বহু পূর্ব থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । সর্বোপরি সমুদ্রপথে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ সবসময়ই ছিল।[৫]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চারটি তালপাতার পুঁথির অনুলিপি সংগ্রহ করে আনেন। পরবর্তীতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় পুঁথিসমূহ 'হাজার বছরের পুরনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুঁথির সূচনায় সংস্কৃত শ্লোক থেকে তিনি একটি নামের ইঙ্গিত পান, যা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে পরিচিত, তবে এটি সংক্ষেপে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' বা চর্যাপদ নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। এ চর্যাপদ অদ্যাবধি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হয়ে আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ, প্রাচীন বাংলায় রচিত এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ সাধকদের দর্শনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সাধন-ভজন প্রভৃতি বিষয়সমূহ কাব্যরূপে স্থান পেয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চর্যাপদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাংলা গান। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, সহজ সাধনার এ গীতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, আউল-বাউল-মারফতি-মুরশিদা গানের প্রবাহ বয়ে চলেছে।'[৬]

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' একজন কবির লেখা কাব্য সংকলন নয়, এতে ২৩/২৪ জন সিদ্ধাচার্যের রচনা স্থান পেয়েছে। প্রায় পঞ্চাশটি চর্যাপদ, কিছু ছড়া-প্রবাদ মিলিয়ে যে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, তার সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্তই বাংলা ভাষা ও সহিত্যের প্রাচীন যুগ। এসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল নৃপতিগণ বঙ্গ-বরেন্দ্র শাসন করতেন। আর উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ সোমপুর বিশ্ববিদ্যালায় এ বরেন্দ্র অঞ্চলেই অবস্থিত। এ সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্যাপদ রচয়িতাদের অনেকেই বসবাস করতেন এবং শিক্ষকতা করতেন, গবেষণা করতেন ও গ্রন্থ রচনা করতেন। চর্যাপদ লেখকদের সবার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সমকালীন বরেন্দ্রভূমি তথা উত্তরবঙ্গ ও আসামের (কামরূপ) বাসিন্দা। বরেন্দ্রভূমি ছিল তখন পুণ্ড্ররাজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং কামরূপসহ সমগ্র পশ্চিম আসাম ছিল পুণ্ড্রভূমিরই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ও কামরূপের ভাষা ছিল অভিন্ন (বঙ্গ-কামরূপী)। চর্যাপদের সর্বপ্রধান লেখক কাহ্নপা (কৃষ্ণপাদ), সরহপা, লুইপা প্রভৃতি ছিলেন সমকালীন বরেন্দ্রভূমিরই বাসিন্দা।[৭]

কাহ্নপা ছিলেন পালযুগের তন্ত্রশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং নাথপন্থি ও সহজপন্থিদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তিনি ছিলেন হেবজ্র, শম্বর এবং জামন্তক প্রভৃতি বজ্রযানী দেবতার সাধন গ্রন্থের লেখক ও দোহা রচয়িতা। তিব্বতি ঐতিহ্য মতে, কাহ্নপার জন্ম উড়িষ্যায়। সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি তাঁর গুরু জলন্ধরী বা হাড়িপার সঙ্গে সোমপুর বিহারে চলে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। সুম্পা ও তারানাথের মতে, কাহ্নপা ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত জনৈক আচার্য যিনি সোমপুর বিশ্ববিদ্যালায়ে বসে ৫০ খানারও ওপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, অধিকাংশই বজ্রযান সাধন সম্পর্কিত। তাছাড়া 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থে তাঁর ১০ খানা গীতি আছে। কাহ্নপা রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কাহ্নপা 'শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকাযোগরত্নমালা' নামে একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন। ঐ পুঁথির একটি অনুলিপি গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে অনুলিখিত হয়েছিল, যা এখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।[৮]

সোমপুর বিশ্ববিদ্যালায়ের বাসিন্দা জলন্ধরীপা বা হাড়িপা (কাহ্নপার গুরু) ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। ঐতিহ্যসূত্রে জানা যায়, হাড়িপার 'গোফা' বা সাধন স্থানের স্মৃতি আজও দিনাজপুরের খোলহাটি গ্রামে বিদ্যমান। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার গ্রিয়ার্সন কানুপা-হাড়িপা-ময়নামতী মানিকচাঁদ কাহিনি সংগ্রহ করে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নামে প্রচার করেন। আজও উত্তরাঞ্চলে সিদ্ধহাড়ি বা হাড়িপার গান জনপ্রিয়। জলন্ধরীপার আরেকজন শিষ্য ছিলেন বি-রুপা। তারানাথের মতে, এ বি-রুপা ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্পো খাম্পোর মতে, তাঁর জন্ম ত্রিপুরার পূর্বদিকে। কথিত আছে যে, বি-রুপা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর সোমপুর মহাবিহারে অবস্থান করে পদ রচনা শুরু করেন। কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবে মদ-মাংস ভোজন করায় গুরু জলন্ধরীপা তাকে সোমপুরবিহার থেকে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কৃত হবার পর নাকি তিনি উড়িষ্যায় চলে যান। তিনি প্রায় ১০ খানা বজ্রযানী পুঁথি এবং

বি-রুপাদ-চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দু খানা পদ ও দোহা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরূপার একটি গীত স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ তিনি চর্যার ৩ নং পদটির রচয়িতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, বি-রুপগীতিকা ও বি-রুপবজ্রগীতিকা নামক দুটি গীতিগ্রন্থের লেখক ছিলেন বি-রুপা।[৯]

গোরক্ষবিজয় ও শূন্যপুরাণে 'চৌরঙ্গীনাথ' নামে জনৈক মহাসিদ্ধের নামের উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ গুরু এবং নাথধর্মের প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চৌরঙ্গীনাথ জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি সহজযানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন পালরাজ দেবপালের অন্যতম পুত্র। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে সমকালীন বরেন্দ্রের বিহার বা বিদ্যাপীঠগুলো, বিশেষ করে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধর্মপাল সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেও দেবপালের সময়েই (৮১০-৮৪৭ খ্রি.) এ বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহন করেছিল এবং দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই সুম্পা ও তারানাথ তাঁদের গ্রন্থে দেবপালকেই সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে মন্তব্য করেছেন।[১০]

ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপা। তিনি ছিলেন সরহপাদের অন্যতম শিষ্য। খুব সম্ভব এ শবরীপাদই বৌদ্ধ শবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। সুম্পার মতে, তিনি বঙ্গাল দেশের এক ব্যাধ বা শবর ছিলেন। ত্যাঙ্গুর তালিকানুযায়ী তিনি প্রায় ১০ খানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদ দুটির রচয়িতা শবরপা। শবরপা-শবরীপাদ ও শবরীশ্বর যদি এক ও অভিন্ন হন, তা হলে বজ্রযোগিনী-সাধন সম্বন্ধেও তাঁর আরো কয়েকখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সোমপুর বিহার গাত্রে শবর-শবরীর দৃশ্য অঙ্কিত থাকায়, অধিকন্ত ২৮ নং চর্যায় "উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী। মোরঙ্গি পীচ্চ পরহীণ শবরী গিব্বত গুঞ্জর মালী।" পার্বত্য পরিবেশের উপস্থিতি থাকায় পণ্ডিতদের কারো কারো ধারণা, শবরপাদ সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাসী ছিলেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই তিনি পদ দুটি রচনা করেছিলেন।[১১]

'লুইপা' নামে জনৈক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের নাম শোনা যায়। চর্যাগীতি গ্রন্থে তাঁর প্রাচীন বাংলায় রচিত দুটি দোহা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন, লুইপা-গীতিকা নামে তাঁর একটি গ্রন্থও ছিল। লুইপা রচিত 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থের পাদটীকা (পুষ্পিকা) হতে জানা যায় যে, তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ সূত্র থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য লুইপার সঙ্গে সোমপুর শিক্ষালয়ে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। ত্যাঙ্গুর গ্রন্থে তাঁর রচিত কয়েকটি বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। লুইপার ধর্মমত সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত।[১২]

বরেন্দ্রের ঐতিহ্যে লালিত এ সোমপুর বৌদ্ধবিহার বহু বৌদ্ধ মহাচার্যের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর ঢাকার মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে এ মনীষীর জন্ম। তিনি পশ্চিম ভারতের

'কৃষ্ণগিরি' বা 'কানহেরি' বিহারে থেকে রাহুলগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধ্যানে দীক্ষালাভ করেন। সেখানে তাঁর নামকরণ হয় 'গুজ্যজ্ঞানবজ্র'। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারে মহাসাংঘিক আচার্য শীলভদ্রের (শীলরক্ষিত) নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং সেসময় তাঁর উপাধি হয় 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি সূত্রে জানা যায়, পালরাজা প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে (১০ম/১১শ শতাব্দী) সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধশালী অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় অতীশ দীপঙ্কর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সেখানে বসেই তিনি 'ভাববিবেকের মধ্যমকরত্ন প্রদীপ' নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মৌখিক ও অনূদিত সর্বমোট গ্রন্থ সংখ্যা ১৭৫। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৬৩ বছর বয়সে দীপঙ্কর পদব্রজে তিব্বতে গমন করেন। উল্লেখ্য, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সেখানকার প্রধান ছিলেন মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি (শান্তিপাদ)। প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। রত্নাকর ১৮ টি তান্ত্রিক গ্রন্থ এবং 'সুখদুঃখদ্বয়-পরিত্যাগ দৃষ্টি' নামে অন্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন মগধের লোক।[১৩]

ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, এ সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র (অন্য দু নাম ভিক্ষু আরণ্যক ও কারস্বরপাদ) বসবাস করতেন। তারানাথের মতে, তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারেরও আচার্য ছিলেন। বোধিভদ্র প্রায় আট দশ খানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন অতুল্যপাদ। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন দেবীকোট বিহারের আচার্য ও শবর সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য অদ্বয়বজ্র বা অবধূতীপা। 'জ্ঞান সার সমুচ্চয়' বোধিভদ্রের একটি মহাযান গ্রন্থ। বোধিভদ্রের গুরু ছিলেন মহামতি।

সমতটবাসী সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক, মহাযানী এবং বিনয় পারঙ্গম বীর্যেন্দ্র নামে জনৈক বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্থবির খ্রিস্টীয় দশম শতকে বুদ্ধগয়ায় একটি সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিলেন।

পাল যুগে ভাষার ব্যবহারঃ

পাল যুগে কাব্য-সাহিত্য, জনগণের কথ্য ভাষা কি ছিল এবং সেই যুগের শিক্ষালয়গুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পঠন-পাঠনে কোন্ ভাষার প্রচলন ছিল-তা আলোচনার প্রয়োজন। আনুমানিক ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্যতম, প্রধান বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার পরেও বাংলাদেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত ভাষা (শৌরসেনী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত প্রভৃতি) এবং তা থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ পরবর্তী স্তর বিভিন্ন অপভ্রংশরূপ, যেমন- শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ভাষা কথাটির তাৎপর্য হলো প্রকৃতির অর্থাৎ জনসাধারণের কথ্য বা বোধ্য ভাষা। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শন-বিচারে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাহিত্য ও কাব্য রচনা কিংবা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চায় অভিজাত শ্রেণি ও জ্ঞানপিপাসু শিক্ষিত লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। এসময় বাংলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্য রচনার কোনো ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কোনো কোনো সময় প্রাকৃতে লিখিত এ ধরনের গ্রন্থকেও তাঁরা

সংস্কৃতে অনুবাদ করে নিতেন। এ দেশের মহাযানী-বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধচার্যরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন তাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত না হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র সংস্কৃত, যাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। যাহোক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল শৌরসেনী অপভ্রংশ। বাংলাদেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেউ কেউ শৌরসেনী অপভ্রংশে কিছু কিছু কাব্য রচনা করে গেছেন। কাহ্নপা, সরহপা প্রভৃতি সাধকেরা এ ভাষাতেই তাঁদের দোহাগুলো রচনা করেছিলেন। তবে লোকায়ত বাঙালি সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়ীয়-বঙ্গীয় রূপ, যাকে বলা যায় প্রাচীন বাংলা। এ মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নিরক্ষর জনগণের কাছে এ দুভাষাই ছিল খুব সহজবোধ্য। এসময় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বা পণ্ডিতদের কেউ কেউ এ দু ভাষাই ব্যবহার করতে শুরু করেন।[১৪]

সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাবনতি:

পাল বংশের সুদীর্ঘ চারশ বছর রাজত্বকালে বহুবার তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতন ঘটেছে। এই উত্থান-পতনের সাথে সাথে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। পাল সম্রাটদের সমৃদ্ধির যুগে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জাঁকজমক ছিল তাঁদের পতনের সময়ে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। খ্রিস্টীয় ৯ম শতকের শেষ দিকে গুর্জর রাজা প্রথম ভোজ ও মহেন্দ্রপাল কর্তৃক পাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করে নেওয়ার পর এ বিশ্ববিদ্যালয় বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসময় সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির ও আবাসিক প্রকোষ্ঠগুলো জরাজীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। খ্রিস্টীয় ১০ম শতকের শেষ দিকে প্রথম মহীপাল (৯৭৭-১০২৭ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার পর সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ সংস্কারসাধন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেন। এ সময়ে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে এবং বহির্বিশ্বে জ্ঞান মর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। যেমন- ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সুবর্ণভূমি অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাংলার ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করায় সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে নির্মিত দালান প্রভৃতির চিহ্নাদিও সেসব স্থানে পরিলক্ষিত হয়। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ এই সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করেন।

কিন্তু একাদশ শতকের শেষভাগে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭০-৭১ খ্রি.) সিংহাসন থেকে উৎখাত করে কৈবর্ত জাতীয় হিন্দু রাজকর্মচারী দিব্যক বরেন্দ্র দখল করেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে তিন পুরুষ (দিব্যক, রুদোক ও ভীম) ব্যাপী বরেন্দ্রে কৈবর্ত শাসন অব্যাহত ছিল। এসময় রাজপৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও অতীত গৌরব প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহুদিন কৈবর্ত শাসনাধীনে থাকার পর রামপাল (১০৭২-১১৬২ খ্রিঃ) বরেন্দ্রে পালশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র বিশ্ববিদ্যলয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে। এগারো শতকের শেষপাদে ও দ্বাদশ শতকের গোড়ায় উৎকীর্ণ, নালন্দায় প্রাপ্ত, 'বিপুল-বিমল-কীর্তি, সজ্জন-আনন্দকন্দ বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের একটি প্রশস্তি লিপি হতে জানা যায়, মহাজ্ঞানী করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর

বিহারের প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব বাংলার বর্মণরাজ জাতবর্মণের (জাতবর্মা) সৈন্যগণ সোমপুর মহাবিহার অগ্নিদগ্ধ করে এর ক্ষতিসাধন করেন। এ সময় করুণাশ্রীমিত্র বিহার থেকে পালিয়ে যাননি, এ জিতেন্দ্রীয় মহাপুরুষ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেন। করুণাশ্রীমিত্রের শিষ্যের শিষ্য অর্থাৎ পরম শিষ্য হলেন বিপুলশ্রীমিত্র। তিনি ভগ্নপ্রায় ও অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত এ বিহারের প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং সোমপুরি বুদ্ধমূর্তিকে বিচিত্র স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করেছিলেন। সোমপুরী বিহার থেকে ৩৬৫ মিটার পূর্বদিকে বৌদ্ধদেবী (বজ্রযান) তারামন্দিরের (সত্যপিরভিটা সংলগ্ন) ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নালন্দায় প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় বারো শতকের একটি লিপিতে এ তারা মন্দিরটি ভিক্ষু বিপুলশ্রীমিত্রের নির্মিত বলে জানা যায়। অন্যমতে, এটি তাঁর দ্বারা সংস্কার সাধিত হয়।[১৫]

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, "পালরাজা রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রি.) সোমপুর বিহারের শিক্ষা–সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার প্রতি উৎসাহিত হয়ে রাজধানী রামাবতীতে জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।" নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার অন্তর্গত বর্তমান আমইড় গ্রামের জগদ্দল নামক স্থানে এ মহাবিহারটি অবস্থিত। আলেকজান্ডার কানিংহাম তাঁর রিপোর্টে রামাবতীকে আমাই বা আমৈর বলেছেন। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আবুল ফজল এ স্থানকে রমৌতি বলে উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ একে আম্বাস শহর বলে থাকে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যগ্রন্থে, প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যে, 'শেখ শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও রামপালের পুত্র মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনে রামাবতীর উল্লেখ আছে। রামপালের সময় সোমপুর শিক্ষায়তনের জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তখন এ জগদ্দল মহাবিহার শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠেছিল। এ বিহারে বসে বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রমুখ আচার্যর বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৬]

পালোত্তর সেন ও মুসলিম আমলে সর্বেচ্চ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে সোমপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও এ বিশ্ববিদ্যলয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষীণ আলো নিয়ে টিকে ছিল। নাথ ও সহজিয়া পণ্ডিতগণ বহুদিন ধরে তাঁদের কর্মকাণ্ড বোধ হয় এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চালিয়ে গেছেন। পাহাড়পুর মন্দিরে প্রাপ্ত মুদ্রাই তার প্রমাণ দেয়।[**] বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তরবঙ্গে (বরেন্দ্রীতে) নাথধর্মের চরম বিকাশ ঘটেছিল এবং নাথধর্মের এ শ্রেষ্ঠযুগেই নাথ সাহিত্যের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, সোমপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে 'যোগী ঘোপা' এবং বগুড়ার 'যোগীর ভবন' নাথ সম্প্রদায়ের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন তথ্যসূত্র মতে, পালযুগের শেষদিকে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে সহজজান ছিল একটি। নাথধর্মের প্রবর্তক ও আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিতে ছিলেন একজন সহজিয়া বৌদ্ধগুরু। তাঁর প্রবর্তিত নাথধর্ম তাঁর প্রধান শিষ্য গুরু গোরক্ষনাথের সময়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্মণ-সেন ও মুসলিম যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও নাথ ধর্ম বাংলার প্রায় সর্বত্র সগৌরবে টিকে থাকে।

তথ্যসূচি:

---

[১] মিনহাজ -ই-সিরাজ, *তবকাত-ই- নাসিরী* , পৃ. ৫৮- ৫৯

[২] বিমলচন্দ্র , *বৌদ্ধভারত,* পৃ. ৪৮

[৩] বিমলচন্দ্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯ ও শ্রী সুকুমার সেন, *বঙ্গ ভূমিকা*, পৃ. ১৬৪

[৪] ড. কল্পনা ভৌমিক, *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৫৩, ২৫৫ ও নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭৫

[৫] *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭

[৬] অতিন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ১৩- ১৭

[৭] *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস- ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* (মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রবন্ধ: *বরেন্দ্রভূমি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব*), পৃ. ৯৩১

[৮] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০১-৬০২ এবং *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রবন্ধ: *প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির পরিচয়*) পৃ. ৫৩০ ও *প্রাগুক্ত* ৯৩১-৯৩২

[৯] *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস- ১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১ ও প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩১

[১০] *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (সমর পাল, প্রবন্ধঃ বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য: প্রাচীন যুগ), পৃ, ৯৭৬

[১১] *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩১ ও নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২

[১২] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯

[১৩] সরদার ফজলুল করিম ও মুনতাসীর মামুন, *ইতিহাস কোষ*, ১ম খণ্ড, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র,পৃ. ৯ ও *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৩, ৫৯৫ ও অতিন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

[১৪] অতিন্দ্র মজুমদার , *প্রাগুক্ত* পৃ. ৯০, ৯১ ও নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭৫- ৫৭৬

[১৫] নীহাররঞ্জন রায় ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩-৫২৪, ৬০৫

[১৬] রবীন্দ্র জার্নাল, ভল্যুম-১৩, আগস্ট, ২০১৪, (ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম, প্রবন্ধ: *নওগাঁর উপজেলাগুলোর নামকরণসহ পরিচিতি*), পৃ. ৩১,৩২; ১৭. *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৪ ও কে এম মিছের , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯।

** বাগদাদের হারুন-অর- রশিদের মুদ্রা ছাড়াও যে সব মুদ্রা সোমপুরে পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে- শের শাহের ছয়টি মুদ্রা (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.), ইসলামশাহ শূরের দুটি মুদ্রা (১৫৫০ ও ১৫৫৩ খ্রি.), গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের তিনটি মুদ্রা (১৫৫৭, ১৫৫৮ ও ১৫৬১ খ্রি.), দাউদ কররানির দুটি মুদ্রা (১৫৭৩ ও ১৫৭৪ খ্রি.), মুঘল সম্রাট আকবরের একটি রৌপ্য মুদ্রা (১৫৭৩ খ্রি.) ও জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর একটি তাম্র মুদ্রা।